নাগিব মাহফুজ আর নেই

কাজী জহিরুল ইসলাম

আল-হুসেইন মসজিদের সামনে একটি কফিন, গাঢ় সবুজ গিলাফে ঢাকা। ভেতরে চির নিদ্রায় শায়িত পাহাড়ের মতো উঁচু এক মানুষ, একজন লেখক। তিনি মিশরের তথা পুরো আরব ভূ-খন্ডের গর্ব, নোবেল বিজয়ী লেখক নাগিব মাহফুজ। গত বুধবারে, ৩০ আগস্ট, বেশ অনেকদিন হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় থাকার পর ৯৪ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কফিনের চারপাশে লাখো জনতার ঢল। মিশরের আপামর জনসাধারণ নেমে এসেছে আল-হুসেইন মসজিদ প্রঙ্গনে তাদের প্রিয় লেখককে শেষবারের মতো দেখার জন্য। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। নাগিব মাহফুজও এমনটিই চেয়েছিলেন। রোগশয্যায় স্বজনদের বলেছিলেন, আল-হুসেইন মসজিদের সামনেই তিনি মিশরবাসীদের শেষবিদায় জানাতে চান। কবি শামসুর রাহমানের মৃত্যুর ক'দিন না যেতেই নাগিব মাহফুজের মৃত্যু। শামসুর রাহমান নোবেল পুরস্কার পাননি, কিন্তু আমার কাছে দুটি মৃত্যুই সমান গুরুত্বপূর্ণ। নাগিব মাহফুজ যেমন আরব ভূ-খন্ডের তথা আরবী ভাষা-ভাষিদের প্রধান ঔপন্যাসিক, কবি শামসুর রাহমানও তার সময়কালের বাংলা ভাষার প্রধান কবি। জনস্রোতে ভাসতে ভাসতে এরপর কফিন এসে পৌছোয় কায়রোর নাসের সিটিতে, যেখানে মিশরের প্রেসিডেন্ট হুসনী মোবারক প্রিয় লেখককে শেষবিদায় জানাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

নাগিব মাহফুজ নোবেল পুরস্কার পান ১৯৮৮ সালে। ভয়াবহ বন্যাকবলিত বাংলাদেশ মাত্র ভেসে উঠেছে ঘোলা জলের নিচ থেকে। কিন্তু তাতে কি? কোটি কোটি সাহিত্যপ্রেমী বাংলাদেশী প্রতিবারের মতো এবারও অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় আছে কে পাবে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার। নাগিব মাহফুজের নোবেলপ্রাপ্তি বঙ্গীয় মুসলমানদের, সন্দেহ নেই, উদ্বেলিত করেছে অন্যবারের চেয়ে অনেক বেশী। আমাদের সমস্ত মিডিয়া মাতোয়ারা হয়ে উঠলো নাগিবের কাভারেজ দিতে। লেখকরা ব্যস্ত তার সাহিত্যকর্মের বঙ্গানুবাদে। মনে আছে সেই সময় আমি ঢাকার একটি সাহিত্যসভায় নিয়মিত যেতাম। 'প্রবাসী পাঠচক্র'। মরহুম আলী হোসেন সাহেব ছিলেন এর কর্ণধার। সৈয়দ আলী আহসান এতে নিয়মিত যোগ দিতেন। এছাড়া আরো যারা আসতেন তাদের কয়েকজনের নাম আমার মনে আছে, খন্দকার মাসুদার রহমান (দাদু), আবু ইসহাক (সূর্য দীঘল বাড়ীর লেখক), মহাতাব উদ্দীন আহমদ, কবি মফিজ উদ্দীন আহমদ (দৈনিক ইনকিলাবের প্রতীষ্ঠাকালের সহকারী সম্পাদক), কবি আমিনুল হক আনওয়ার, রম্যকার এস জিয়াউদ্দীন আহমেদ প্রমুখ। এখানে উল্লেখ্য যে এদের কেউই আজ আর বেঁচে নেই। 'প্রবাসী পাঠচক্র'যোগে সুলেখক আলী হোসেন সাহেবের সাথে আমার খুব সখ্য গড়ে ওঠে। বলা যায় অসম বয়সের গভীর বন্ধুত্ব। আমি তখন মাত্র গদ্য লিখতে শুরু করেছি। 'একাকী নক্ষত্র' উপন্যাসটি শেষ করে আমি আলী হোসেন সাহেবকে পড়তে দিই। পরে এটি প্রকাশ করে পল্লব পাবলিশার্স। তিনি লেখাটি আদ্যপান্ত পরে আমার ওপর খুব রেগে গেলেন। 'তুমি কি নাগিব মাহফুজ হতে চাও?' আমি আসলে তখনও নাগিব মাহফুজের কোনো লেখাই পড়িনি। আমার উপন্যাসে একটি দৃশ্য ছিল, গল্পের নায়ক চারু হায়দার কল্পনা করছে, বাবা ওর মা-কে বুকে টেনে আদর করছেন। এই দৃশ্যে চারু আনন্দিত। কারণ এর অর্থ হলো, কষ্টের মেঘ কেটে গেছে। কিন্তু আলী হোসেন সাহেব তা কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। এরপর তিনি আমাকে নাগিব মাহফুজের একটি গল্পের দৃশ্য বর্ণনা করে শোনালেন। গল্পের নায়ক টেলিফোনে কথা বলছে। ওর পরণে কোন কাপড় নেই। সে আনমনে

অন্যহাতে নিজের শিশ্ন মন্থন করছে। এটি কোন গল্পে আছে আমি জানি না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আলী হোসেন সাহেব নিজে পড়েই এ কথা বলেছিলেন। তখন পর্যন্ত নাগিব মাহফুজ সম্পর্কে আমার ধারণা ওইটুকুই।

মোহাম্মদ সালমাউইয়ের সাথে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে নাগিব মাহফুজ বলেছেন নোবেল পুরস্কার তার জীবনের একটি বড় ঘটনা। তিনি আনন্দিত এবং উদ্বেলিত কিন্তু বড় দেরীতে তিনি এই পুরস্কারটি পেয়েছেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, 'এর পরে আমি আসলে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন কাজ করতে পারি নি শুধুমাত্র ***ইকোজ অফ এন অটোবায়োগ্রাফি'*** ছাড়া। সারা বিশ্বের অন্য অনেক মুসলিম ইন্টেলেকচুয়ালের মতো নাগিব মাহফুজও এই পুরস্কারটির ব্যাপারে খুব হতাশ ছিলেন। তিনিও মনে করতেন মুসলমান লেখক হিসাবে নোবেল পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই যখন তার নাম ঘোষণা করা হলো তিনি শুধু আনন্দিতই হননি অবাক হয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী।

কায়রোর গামালিয়া নামক স্থানে ১৯১১ সালে জন্মগ্রহন করেন নাগিব মাহফুজ। শিশু মাহফুজের কাছে তার সিভিল সার্ভেন্ট পিতা ছিলেন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। মা তাকে প্রায়শই ইজিপশিয়ান মিউজিয়ামগুলিতে নিয়ে যেতেন। শৈশবেই মাহফুজ প্রচুর ইতিহাসভিত্তিক বই পড়ে ফেলেন। যার প্রভাব পরে তার ৩০টি উপন্যাসের প্রায় অনেকগুলোতেই। মাহফুজ তখন মাত্র সাত বছরের শিশু। ১৯১৯-এর বিপ্লব তার শিশুমনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তিনি জানালা দিয়ে দেখতেন ইংরেজ সৈনিকেরা মিছিলে গুলিবর্ষণ করছে। তিনি ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেন। স্কুলে সায়েন্স পড়তে পড়তে সাহিত্যের প্রতি গভীর অণুরাগের কারণে সায়েন্স বাদ দিয়ে তিনি সাহিত্যে ভর্তি হয়ে যান। মাধ্যমিক পাশ করে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে দর্শন শাস্ত্রে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৪ সালে গ্রাজুয়েশন এবং ১৯৩৬ সালে মাস্টার্স করে তিনি সিদ্ধান্ত নেন একজন প্রফেশনাল লেখক হিসাবে জীবন শুরু করার। তিনি আর-রিসালায় একজন সাংবাদিক হিসাবে যোগদান করেন এবং আল-হিলাল ও আল-আহরামে নিয়মিত কন্ট্রিবিউট করতে থাকেন। ঔপন্যাসিক হিসাবে আত্মপ্রকাশের আগে তিনি ৮০টি ছোটগল্প এবং আর্টিকেল লেখেন বিভিন্ন কাগজে। প্রাচীন মিশরের ওপর রচিত জেমস বাইকির একটি বইয়ের আরবী অনুবাদই হলো নাগিব মাহফুজের প্রকাশিত প্রথম পুস্তক। ১৯৩৮ সালে তার ছোটগল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়। এর পরের বছরই তিনি মিশরের সরকারী চাকরীতে যোগ দেন এবং পরবর্তি ৩৫ বছর মিশরের ব্যুরোক্রেসির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৫০ সালে নাগিব মাহফুজের এক বৃহৎ কর্ম ১৫০০ পৃষ্ঠার বই '***কায়রো ট্রাইলোজি'*** প্রকাশিত হয়। তিনটি উপন্যাসের সংকলন ***কায়রো ট্রাইলোজি***। উপন্যাস তিনটি হলো, ***প্যালেস ওয়াক, প্যালেস অব ডিজায়ার এবং সুগার স্ট্রীট***। কায়রোর বিভিন্ন রাস্তার নামানুসারে উপন্যাসগুলির নামকরণের পেছনে যে লজিকটি কাজ করে তা হলো, এই রাস্তাগুলিকে কেন্দ্র করেই বেড়ে উঠেছে তার শৈশব-কৈশোর। এই উপন্যাসগুলিতে তিনি কায়রোর পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যাবস্থাকে দেখিয়েছেন। মাহফুজের কায়রো ট্রাইলোজিকে ডিকিন্স এবং টলস্টয়ের কাজের সাথে তুলনা করা হয়।

মাহফুজের সাহিত্যজীবনের শুরুটা কিন্তু খুব স্মুথ ছিল না। ১৯২৯ সাল থেকে তিনি লিখতে শুরু করেন। মাজাল্লা প্রকাশনীর সম্পাদক তার সব লেখা বাতিল করে দিয়ে বলেছিলেন, তোমার মধ্যে সম্ভাবনা আছে, তবে এখনো বই বের করার উপযুক্ত হয়নি। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে তার প্রথম গল্প প্রকাশ করে মাজাল্লা, অনেকটা আকস্মিকভাবেই। এরপরও প্রকাশনা তার জন্য তেমন সহজ হয়ে ওঠেনি। তার এক বন্ধু, একজন লেখক, মাহফুজের লেখার খুব ভক্ত ছিলেন। তিনি একদিন এসে নাগিবকে বললেন, তার ভাইয়ের একটা প্রেস আছে। এরপর সেই বন্ধু আরো কয়েকজনকে নিয়ে একটা

প্রকাশনী খুললেন। সেখান থেকে প্রতি বছর নাগিব মাহফুজের একটি করে বই বের হতো। জীবিকা নির্বাহের জন্য তাকে কখনোই লেখালেখির ওপর নির্ভর করতে হয়নি। নাগিব মাহফুজ নিজেই বলেন, 'আমি সবসময়ই সরকারী চাকরী করতাম। বরং লেখালেখির পেছনে ব্যয় করেছি প্রচুর। বই কিনেছি, কাগজ কিনেছি। ৮০টি গল্প প্রকাশ করেছি বিনা পয়সায়। এমনকি আমার প্রথম উপন্যাস দিয়েছি বিনা পয়সায়। অনেক পরে লেখালেখি থেকে অর্থ এসেছে। এদিক থেকে ***জাবালাওয়ি*** আমার সবচেয়ে সফল বই।

তরুণ লেখকদের সাথে নাগিব মাহফুজের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তিনি প্রতি সপ্তাহে কাসিনো নাসের আল-নীলে একটি সাহিত্যের সেসনে যোগ দিতেন। যেখানে ইজিপশিয়ান তরুণ কবি, লেখকরা অংশ নিতো। তাদের সাথে তিনি খোলাখুলি অনেক বিষয়ে মত বিনিময় করতেন। নাগিব মাহফুজ তার দেশের গণতন্ত্র নিয়েও খোলাখুলি অনেক কথা বলেছেন। তিনি বলেন, কিং নাসের-এর সময়ে মানুষ কথা বলতে ভয় পেতো। আমরা ক্যাফেটেরিয়াতে বসতাম কিন্তু খোলামেলা কোনো বিষয়ে কথা বলতে পারতাম না। আমার মেয়েরা স্কুলে যেত। সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতাম, যদি ওদের কোন কথাকে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। না জানি কোন বিপদ আসে। সাদাতের সময়ে অনেক বেশী কথা বলার স্বাধীনতা ছিল। হুসনি মোবারক গণতান্ত্রিক মানুষ। তবে তার সংবিধান গণতান্ত্রিক না। সংবিধান সংশোধন করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নাগিবের **আল কাউরা আল-জাদিদা** এবং **রাদিবাস** বই দুটিকে নিষিদ্ধ করা হয়। **রাদিবাস**-এ তিনি দেখান জনগণ রাজাকে হত্যা করে। মিশর এটাকে মেনে নিতে পারে নি। এই বই প্রকাশের পর তাকে বামপন্থি আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু নাগিব মাহফুজ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এটা ইতিহাসভিত্তিক একটা ফিকশন। কিন্তু ওরা বলে, এটা মিথ্যা ইতিহাস। নাগিব মাহফুজ সালমান রুশদীকে সমর্থন করায় তাকে মুসলিম ফান্ডামেন্টালিস্টরা হত্যা করতে চায়। তিনি নিজে স্যাটানিক ভার্সেস না পড়লেও আলেক্সান্দ্রিয়াস্থ মার্কিন দূতাবাসের সাংস্কৃতিক এ্যাটাচি তাকে প্রতিটি চাপ্টার ব্যাখ্যা করে শোনান। তিনি মনে করেন রুশদী এই গ্রন্থে ইসলামকে অবমাননা করেছেন। তবে খোমেনীর ঘোষণাকেও তিনি মেনে নিতে পারেন নি। হজ্জব্রত পালন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে নাগিব মাহফুজ বলেন, 'আমি ভিড় অপছন্দ করি'। নাগিব মাহফুজ সচরাচর কোনো পার্টি বা দাওয়াতে যেতেন না। একাকীত্বকেই বেশী ভালোবাসতেন। এমনকি তিনি বন্ধুদের বাসায়ও কখনো যান নি। তিনি তাদের সাথে বড়জোর ক্যাফেটারিয়ায় দেখা করতেন।

নাগিব মাহফুজকে বলা হয় আরব্য উপন্যাসের জনক। মিশরের প্রকৃতি, ইতিহাস, উর্বর ভ্যালি, নানান জাতি ধর্মের সহাবস্থান, বিভিন্ন চরিত্রের শাসক সব মিলিয়ে মিশর নাগিব মাহফুজের জন্য ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাইদ বলেছেন, মাহফুজের জন্য দুনিয়ার আর কোন স্থান বিকল্প ছিল না। মিশরই তার উপযুক্ত স্থান। তিনি সারা জীবনে প্রায় কখনোই মিশরের বাইরে যান নি। এমনকি নোবেল পুরস্কার আনতেও তিনি তার মেয়েকে পাঠান। তিনি সালমান রুশদিকে সমর্থন করায় অনেক আরব লেখকের মতো তিনিও ছিলেন মৌলবাদীদের 'ডেথ লিস্ট'-এ। একবার ক'জন মৌলবাদী সমর্থক তাকে ছুরিকাহত করলে অনেকদিন তার ডান হাত প্যারালাইজড ছিল। অবশ্য মিশর তাকে দিয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান। সরকার এবং জনগন। তিনি মিশরের জনগনের ফুলেল ভালোবাসা নিয়েই ৩০ আগস্ট ২০০৬-এ ৯৪ বছর বয়সে চিরনিদ্রায় শায়িত হন। পৃথিবীর অনেক দেশের মতো বাংলাদেশের মুসলিম লেখকদের কাছেও নাগিব মাহফুজ ছিলেন অনুপ্রেরণার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তথ্যসূত্র:

১। শার্লট এল শাব্রাউই-এর সাথে সাক্ষাতকার, ১৯৯২
২। বিবিসি নিউজ, ৩১ জুলাই ২০০৬
৩। মোহাম্মদ সালমাউই-এর সাথে সাক্ষাতকার, মার্চ ২০০৬
৪। http://www.kirjasto.sci.fi/mahfouz.htm

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
৩১ আগস্ট, ২০০৬